

বাংলাদেশে জমি রেজিস্ট্রীকরণ পদ্ধতির আধুনিকায়ন : একটি সমীক্ষা

ছিদ্দিকুর রহমান*

ভূমিকা

ঔপনিবেশিক বৃটিশ শক্তি এ দেশের শাসনভার গ্রহণ করার পূর্ব পর্যন্ত দলিল রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া জনসাধারণের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। তৎকালে মানুষের নৈতিক মান ছিল অতি উন্নত। জমি-জমাসহ অন্যান্য সম্পত্তির আদান-প্রদানে মানুষের ছিল পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস আর গভীর মূল্যবোধ। বিশ্বাস ভংগের নজিরও ছিল বিরল। কিন্তু বৃটিশ শক্তি অবাঞ্ছিতভাবে এ দেশ দখল করার পর থেকে লাগামহীনভাবে সামাজিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস, লোভ, পরশ্রীকাতরতা, হিংসা, ঘেঁষ এ দেশের শান্ত সমাজকে কলুষিত করে। এহেন পরিস্থিতিতে জনসাধারণের মধ্যে জমি-জমাসহ অন্যান্য আদান-প্রদানের বিভিন্ন চুক্তি, দলিল-দস্তাবেজের আকারে লিপিবদ্ধ ও রেজিস্ট্রী করে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ ও আইনগত নিদর্শন সৃষ্টির প্রয়োজন অনুভূত হয় ১৯০৮ সন থেকে। বহু কালের পুরাতন রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি আজ অনেক ক্ষেত্রে যুগের চাহিদা মিটাতে পাচ্ছে না। তাই এ পদ্ধতির আধুনিকায়ন দরকার।

উদ্দেশ্য ও পরিধি

রেজিস্ট্রেশন আইন বহু বিবর্তন এবং দীর্ঘ দিনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে ১৯০৮ সনে অ্যাক্ট XVI-এর মাধ্যমে একটি সুবিন্যস্ত এবং পরিশুদ্ধ রূপ লাভ করে। প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের মাধ্যমে বর্তমান রেজিস্ট্রীকরণ পদ্ধতিকে কিভাবে আধুনিকায়ন ও জনকল্যাণকর করা যায় তা এই সমীক্ষার বিষয়বস্তু।

প্রাসংগিক আলোচনায় রেজিস্ট্রেশন আইনের মৌলিক দিক আলোচনাসহ রেজিস্ট্রীকরণ পদ্ধতিকে আধুনিকায়ন ও গতিশীল করার প্রচেষ্টা চালান হয়েছে।

তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি

রেজিস্ট্রেশন বিভাগের বিস্তারিত তথ্য রেজিস্ট্রী পরিদপ্তর হতে সংগ্রহ করা হয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশের রেজিস্ট্রীকরণ পদ্ধতির আধুনিকায়ন সম্পর্কে আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, প্রাক্তন আই. জি. আর এবং বর্তমানে ঢাকা জেলা ও দায়রা জজ জনাব হাবিবুর রহমান তালুকদার, ভারপ্রাপ্ত মহা-পরিদর্শক জনাব এ.

* জেলা ও দায়রা জজ, চাঁদপুর।

এফ. এম. রেজা-ই-করিম, রেজিস্ট্রেশন অফিসসমূহের পরিদর্শক জনাব রুস্তম আলী, নারায়ণগঞ্জের জেলা রেজিস্ট্রার জনাব আঃ বারীসহ বেশ কিছু সাব-রেজিস্ট্রারগণের সংগে আলোচনা করা হয় এবং প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এতদ্ব্যতীত নিবন্ধ রচনায় কিছু মূল্যবান পুস্তকাবলী ও সরকারী নির্দেশাবলীর সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে যা পুস্তক-বিবরণীতে উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া নিজের চাকরি জীবনের অভিজ্ঞতা এ লেখনীতে কাজে লাগান হয়েছে।

সীমাবদ্ধতা

রেজিস্ট্রেশন আইনের বিভিন্ন ধারার সাথে বাংলাদেশে প্রচলিত অনেক গুরুত্বপূর্ণ আইনের বিভিন্ন ধারা সংশ্লিষ্ট এবং সম্পর্কিত। বাংলাদেশের রেজিস্ট্রীকরণ পদ্ধতির আধুনিকায়ন করার উদ্দেশ্যে বহু পরীক্ষিত রেজিস্ট্রেশন আইনের কোন ধারা পরিবর্তন করলে ঐ সকল আইনের ধারাসমূহ পরিবর্তন করতে হয়। তাই খুব সতর্কতার সাথে চিন্তা-ভাবনা করে রেজিস্ট্রেশন আইনের এবং রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতির পরিবর্তনের সুপারিশ করতে হবে। বাংলাদেশের রেজিস্ট্রীকরণ পদ্ধতির আধুনিকায়নের এমন সুচিন্তিত প্রস্তাব দিতে হবে যা কার্যকরী করা যায় এবং যা বাস্তবায়নে এই পদ্ধতি গতিশীল, সহজ ও জনকল্যাণকর হয়। চিন্তা-ভাবনা না করে যদি এই বহুল পরীক্ষিত পদ্ধতির অপসারণ অথবা পরিবর্তনের প্রস্তাব দেয়া হয় এবং তা কার্যকরী হয় তবে জনগণ পতিত হবে এক সীমাহীন দুর্ভোগের মধ্যে এবং অসুবিধা দেখা দিবে প্রচলিত নিয়মে। তাই বাংলাদেশের রেজিস্ট্রীকরণ পদ্ধতির আধুনিকায়ন করার উদ্দেশ্যে রেজিস্ট্রেশন আইন এবং বর্তমানে প্রচলিত পদ্ধতির যা পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংযোজন করা যেতে পারে তার মধ্যেই এ সমীক্ষা সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে।

রেজিস্ট্রেশন আইনের ক্রমবিকাশ

১৭৮১ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় জর্জের আমলে রেজিস্ট্রীকরণ আইন সর্বপ্রথম বংগীয় বিধিবদ্ধ আইন নামে প্রাদেশিক আইন হিসেবে জন্মলাভ করে। উক্ত আইনের ১৪ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ত্রিবিধ ক্ষমতা নিয়ে যথা—দলিল, রেজিস্ট্রীকরণ, জরীপকরণ ও নামজারীকরণের প্রথম রেজিস্ট্রার মিঃ এডওয়ার্ড টিরেটা নিয়োগ লাভ করেন। পরবর্তীকালে ইংরেজ শাসকদের স্বার্থে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বিস্তারিত আইন প্রণয়ন ও উক্ত ত্রিবিধ ক্ষমতা পৃথকীকরণের তাগিদে ১লা মে, ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে প্রণীত আইন পূর্ববর্তী আইনের সাথে সংযোজিত হয়। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দেই সর্বপ্রথম হিন্দুদের 'দণ্ডক' গ্রহণ ও সম্পত্তি উইল করার বিধান প্রণয়ন করা হয়। এই আইনের আওতায় সর্বপ্রথম কলকাতার বাইরে ঢাকা, মুর্শিদাবাদ ও পাটনায় তিনটি পৃথক রেজিস্ট্রী অফিস স্থাপন করা হয় এবং অফিসগুলোর তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব প্রদান করা হয় দেওয়ানী আদালতের

রেজিস্ট্রার (Registrar)-এর উপর। প্রকৃতপক্ষে এই আইনের বিধানসমূহ রাণী এ্যানের রাজত্বকালে ইয়র্ক শ্যায়ারের রেজিস্ট্রিকরণ আইনের অনুকরণে প্রণীত হয়।

পরবর্তীকালে ১৭৯৩ সালে বিধানাবলীকে সমৃদ্ধ, স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সময়োপযোগী করার জন্য বিভিন্ন সময় নতুন আইনের সংযোজন ও পুরাতনের সংশোধন করা হয়। তখনই কাজিউল কাজ্জাত (Head Kazi of Bengal)-এর পদ সৃষ্টি করে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার বেশ কিছু সংখ্যক জেলায় নিয়োগ করে তাঁদের অধিক্ষেত্রভুক্ত দলিলাদি সংরক্ষণ ও অনুলিপি সরবরাহ করার দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

১৭৯৩ সালের সামগ্রিক বিধানাবলী ১৮০৩ সালে পুনরায় বিধিকরণ করে সাধারণ আইনের অন্তর্ভুক্ত করা হয় যা ১৮০৫ সালে উড়িষ্যার কটক অবধি বিস্তৃতিলাভ করে।

১৮৩৮ সালে সর্বপ্রথম উপ-রেজিস্ট্রার (Sub-Registrar)-এর অফিস প্রতিষ্ঠার আইন প্রণয়ন করা হয়। ১৮৪৩ সালে প্রণীত আইনের দ্বারা রেজিস্ট্রিকৃত দলিলসমূহকে অরেজিস্ট্রিকৃত (Un-Registered) দলিলাদির তুলনায় অগ্রাধিকার দেয়ার সুস্পষ্ট বিধান রাখা হয়। এরপর ১৮৪৭, ১৮৫১, ১৮৫৬, ১৮৫৯ সালে রেজিস্ট্রিকরণ আইনের ধারাবাহিকতা বাজায় রেখে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সময়োপযোগী করে সংশোধন করা হয়।

পরবর্তীকালে ১৮৬৪ সালে Act XVI দ্বারা সর্বপ্রথম ১৭৯৩ সালের প্রাদেশিক বিধানাবলীকে বাতিল করে General Registration Act প্রণয়নকরত ১লা জানুয়ারী, ১৮৬৫ সাল হতে কার্যকর করা হয়।

এরপর ১৯৬৬ সালে সংযোজিত নতুন আইন দ্বারা রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতির এক আমূল পরিবর্তন করে দলিল সম্পাদনকারী ছাড়াও সম্পাদনকারীর অন্য যে কোন প্রতিনিধি দ্বারা দলিল দাখিল করার বিধান প্রবর্তন করা হয়। পরবর্তীতে ১৮৭১ সালে Registrar General-এর পদ বাতিল করে নতুন ও বর্ধিত দায়িত্ব দিয়ে Inspector General of Registration-এর পদ সৃষ্টি করা হয়। এভাবে ১৮৬৫, ১৮৬৬, ১৮৬৮, ১৮৭১, ১৮৭৭, ১৮৭৯, ১৮৮৩, ১৮৮৬, ১৮৮৮, ১৮৮৯, ১৮৯১ ও ১৮৯৯ সালে বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করে মূল আইনের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে যুগের চাহিদা মেটানো হয়।

সর্বশেষ ১৯০৮ সালে পূর্বের সকল বিক্ষিপ্ত আইন ও বিধানগুলোকে সংকলিত করে বর্তমানে রেজিস্ট্রেশন আইন Act XVI প্রণয়ন করা হয়। বর্তমানে যে পরিপূর্ণরূপ দেখা যায় তা বস্তুত ১৯০৮ সালের সংকলন ও সংশোধনের ফল।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর ১৯০৮ সালের রেজিস্ট্রেশন আইনকে সামগ্রিকভাবেই গ্রহণ (Adopt) করা হয়। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৪৯ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে ১৯০৮ সালের রেজিস্ট্রেশন আইন একই পরিসরে

বাংলাদেশে বলবৎ করা হয়, যদিও পরবর্তীতে ১৯৮৫ সালের ৩০ ও ৬৭ ধারা বিলুপ্ত করে জেলা নিবন্ধকের নিবন্ধন ক্ষমতা বাতিল করা হয়েছে।

এ ভাবে রেজিস্ট্রেশন আইনের ক্রম ইতিহাসকে সূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। ১৭৮১ সাল হতে ১৮৬৪ সাল পর্যন্ত প্রাদেশিক আইন ও ঐচ্ছিক রেজিস্ট্রীকরণের যুগ এবং ১৮৬৪ সাল হতে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সর্বভারতীয় সাধারণ আইন ও বাধ্যতামূলক রেজিস্ট্রেশনের যুগ।

রেজিস্ট্রেশন আইনের উদ্দেশ্য

একটি কার্যকর রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া উদ্ভাবনের লক্ষ্যে রেজিস্ট্রেশন আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যসমূহ অন্তর্নিহিত ছিল :

- (১) দলিলের বিশুদ্ধতার চূড়ান্ত নিশ্চয়তা প্রদান ;
- (২) আদান-প্রদান জনসাধারণে প্রচার ;
- (৩) জাল-জালিয়াতি রোধ ;
- (৪) কোন সম্পত্তি লেনদেন হয়েছে কিনা তা নিরূপণের সুযোগ সৃষ্টি ; এবং
- (৫) স্বত্ত্বের মূল দলিল হারিয়ে গেলে বা বিনষ্ট হলে স্বত্ত্ব সংরক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি।

রেজিস্ট্রেশন আইনের বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করতে হলে উপরোক্ত লক্ষ্যসমূহ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকা প্রয়োজন। নতুবা আইনের কিছু কিছু বিধান দুর্বোধ্য ও অসংগত মনে হতে পারে।

রেজিস্ট্রেশন আইনের মৌলিক দিক

১৯০৮ সালের রেজিস্ট্রীকরণ আইন ১৫টি অংশে ও ৯১টি ধারায় বর্ণিত হয়েছে। মূল আইনের বিধানসমূহের প্রয়োগ ও প্রকৃতি ব্যাখ্যা করে ১১৮টি বিধি বলবৎ আছে। এ ছাড়া বিভাগীয়, আদেশ-উপদেশ, কতিপয় সরকারী প্রজ্ঞাপন ও আদেশ রেজিস্ট্রীকরণ পদ্ধতির সহায়ক হিসেবে বলবৎ রয়েছে।

রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি

বাংলাদেশের রেজিস্ট্রীকরণ পদ্ধতি নিম্নলিখিত ধাপে হয়ে থাকে ; যথা :—

(ক) **দলিল প্রস্তুতকরণ :** উপযুক্ত পরিমাণ স্ট্যাম্প-কাগজে লিপিবদ্ধ নিদর্শন পত্রের নামই দলিল। প্রয়োজনীয় ফি পরিশোধ করার পর স্ট্যাম্প সংগ্রহ করে কোন সনদপ্রাপ্ত দলিল লেখকের দ্বারা সঠিকভাবে দলিল প্রস্তুত করাতে হয়। দলিলদাতা বা দাতাগণ নিজ হাতে লিখে বা টাইপ করেও দলিল প্রস্তুত করতে পারেন। সম্পাদিত দলিলের মাধ্যমে দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে সম্পত্তি আদান-প্রদান হয়ে থাকে। দলিল সম্পাদনের তারিখে দাতা এবং গ্রহীতা সম্পত্তি বা জমির পরিমাণ এবং এর মূল্য স্পষ্টভাবে বর্ণনা

করবেন। স্থাবর সম্পত্তির দলিলের তফসিলে সম্পত্তির সনাক্তযোগ্য বিবরণ অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।

রেজিস্ট্রেশন অফিসার অসম্পূর্ণ বিবরণ সম্বলিত স্থাবর সম্পত্তির দলিল রেজিস্ট্রী করতে অস্বীকার করতে পারেন। সম্পত্তির সম্পূর্ণ বিবরণ দলিলে অবশ্যই থাকতে হবে, যেন উক্ত সম্পত্তি সনাক্ত করতে কোন প্রকার অসুবিধা না হয়। কি প্রকারে সম্পত্তির বিবরণ প্রদান করতে হয়, তা রেজিস্ট্রীকরণ আইনের ২১ ধারায় বিধৃত রয়েছে। উক্ত ধারা অনুযায়ী দলিলে সম্পত্তির দাগ নং, খতিয়ান নং, এবং এলাকা ও এর আশপাশের রাস্তাঘাট বা সুরণীয় স্থানসমূহের বিবরণ উল্লেখ করতে হবে।

(খ) দলিল দাখিলকরণ পদ্ধতি ও রেজিস্ট্রীকরণ : দলিল সঠিকভাবে সম্পাদন করা এবং কমপক্ষে দু'জন সাক্ষী দ্বারা তা স্বাক্ষরিত হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট স্থাবর সম্পত্তির বৃহত্তর অংশ যে সাব-রেজিস্ট্রী অফিসের আওতাধীন এলাকায় অবস্থিত সেই অফিসের সাব-রেজিস্ট্রারের নিকট রেজিস্ট্রীর জন্য দাখিল করতে হবে (২৮ ধারা)। দলিলদাতা বা দাতাগণের মধ্যে যে কোন একজন, দাতা বা গ্রহীতা একাধিক হলে, তাদের যে-কোন একজন, দাতা বা গ্রহীতার প্রতিনিধি, দাতা বা গ্রহীতার ক্ষমতা প্রাপ্ত মোক্তার দলিল দাখিল করতে পারেন (৩২ ধারা)।

আমমোক্তারনামা সম্পর্কে রেজিস্ট্রেশন আইনের ৩০ ধারায় বলা হয়েছে যে, রেজিস্ট্রার বা সাব-রেজিস্ট্রারের সম্মুখে অথবা সম্পাদনকারী বিদেশে থাকলে ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে বা নোটারী পাবলিক অথবা কোর্টের জজের সম্মুখে তা সম্পাদন করতে হবে এবং উক্ত কর্মকর্তাগণ তা সত্যায়ন করবেন।

দলিল সম্পাদনের তারিখ হতে অনধিক ৪ মাসের মধ্যে জরিমানা ছাড়া (২৩ ধারা) এবং জেলা রেজিস্ট্রারের অনুমতি সহকারে সম্পাদনের তারিখ হতে ৮ মাসের মধ্যে প্রকৃত ফিসের অনূর্ধ্ব ১০ গুণ জরিমানা প্রদান করে দলিল রেজিস্ট্রীর জন্য দাখিল করা যেতে পারে (২৫ ধারা)। দলিলদাতাকে তার নিজ গ্রামের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি সনাক্ত করবেন। দলিলদাতার পরিচিতি সম্পর্কে রেজিস্ট্রার কর্মকর্তা সন্তুষ্ট হলে এবং দাতা উক্ত দলিলের সম্পাদন স্বীকার করলে রেজিস্ট্রার দলিলটি রেজিস্ট্রীর জন্য গ্রহণ করতে পারেন।

দাখিলকৃত দলিল রেজিস্ট্রীভুক্তির ক্রমানুযায়ী সংশ্লিষ্ট বালাম বহিতে নকল করে রাখা হবে (৫২ (১) (গ) ধারা)। দলিল নকল করার পর দলিলের সংশ্লিষ্ট তথ্যাবলীর সূচী করে (৫৫ ধারা) মূল দলিল দাখিলকারক অথবা তার প্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রতিনিধির নিকট ফেরত দেয়া হবে (৬১ (২) ধারা)।

(গ) দলিল দাখিল অগ্রাহ্যকরণ : নিম্নবর্ণিত যে-কোন কারণে নিবন্ধন কর্মকর্তা রেজিস্ট্রীর জন্য দলিল গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করতে পারেন :

- (১) দলিলে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তির বহুর অংশ নিবন্ধন কর্মকর্তার এলাকার অন্তর্ভুক্ত না হলে ;
- (২) যদি দলিল সংশ্লিষ্ট জেলার সাধারণ ব্যবহৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ না হয়, অথবা দলিল নিবন্ধন কর্মকর্তার আবোধ্য কোন ভাষায় লিখিত হয় এবং বোধগম্য ভাষায় এর অনুবাদের অনুলিপি সংগে দাখিল না করা হয় (১৯ ধারা) ;
- (৩) যদি দলিলে কৈফিয়ৎ ব্যতিরেকে ২ পংক্তির মধ্যে লেখা, পংক্তিতে শূন্যস্থান, ঘষামাজা বা কোন পরিবর্তন থাকে (২০ ধারা) ;
- (৪) যদি দলিলে লিখিত সম্পত্তির বিবরণ সনাক্ত করার জন্য পর্যাপ্ত না হয় ;
- (৫) যদি অনুমোদিত সময়সীমার মধ্যে দলিল দাখিল না করা হয় (২৩-২৬) ধারা) ;
- (৬) যদি দলিল উপযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক দাখিল করা না হয় (৩২, ৩৩, ৪০ ধারা)।

প্রয়োজনীয় স্ট্যাম্পের কাগজে দলিল লিপিবদ্ধ করা না হয়ে থাকলে তা আটক করে কালেক্টরের নিকট প্রেরণ করা হয় (স্ট্যাম্প এ্যাক্টের ৩৩ ধারা) এবং কালেক্টর বিবেচনা করে অনাদায়ী স্ট্যাম্প শুল্ক উদ্ধার ও জরিমানা আদায় করার পর দলিল রেজিস্ট্রী করা হয়।

(ঘ) দলিল রেজিস্ট্রী অগ্রাহ্যকরণ : নিম্নবর্ণিত কারণে সম্পাদিত দলিল রেজিস্ট্রী অগ্রাহ্য হয় :

- (১) দলিলদাতা দলিলের সম্পাদন অস্বীকার করলে (৩৫ ধারা) ;
- (২) দলিলদাতা নাবালক, নির্বোধ বা পাগল হলে (৩৫ ধারা ৩-খ) ;
- (৩) মৃত দাতার ওয়ারিশ দলিল সম্পাদন অস্বীকার করলে (৩৫ ধারা ৩-গ) ;
- (৪) দলিলের ফিস পরিশোধ না করা হলে (৮০ ধারা) ;
- (৫) নিবন্ধন কর্মকর্তার সন্তুষ্টি অনুযায়ী দাতা সনাক্ত না হলে ;
- (৬) প্রয়োজনীয় আয়কর দায়মুক্তির প্রত্যয়নপত্র দাখিল না করা হলে (আয়কর অধ্যাদেশ ১৮৪ ধারা) ;
- (৭) দলিলের সংগে হলফনামা সংযুক্ত না করা হলে (১৮২/৭২ অধ্যাদেশের ৪ নং ধারা)।

(ঙ) কমিশন ও ভিজিট : দাতা কর্তৃক সম্পাদিত দলিল পরীক্ষার জন্য বা দাখিল গ্রহণের জন্য নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণ কমিশন/ভিজিটের আবেদন করতে পারেন (৩৮ ও ৩৩ ধারা) ;

- (১) শারীরিক অক্ষমতার কারণে অফিসে উপস্থিত হতে অপারগ ব্যক্তি ;
- (২) কারাগারে আবদ্ধ ব্যক্তি ;
- (৩) পর্দানশিন মহিলা।

প্রত্যেক দলিলে কমিশনের জন্য 'কে' দফায় ১০.০০ টাকা এবং দলিল দাখিলের জন্য 'জে' দফায় ৩৫.০০ টাকা ফিস এবং এর সাথে গ্রামাঞ্চলে প্রতি মাইল ভ্রমণের জন্য কর্মকর্তা এবং তার পিয়নকে যথাক্রমে ১.০০ এবং ০.৪০ টাকা হারে এবং ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, খুলনা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম শহরের জন্য ২৫.০০ টাকা এবং অন্যান্য শহরের জন্য ১০.০০ টাকা হারে খরচা প্রদান করা হবে।

(চ) মামলা ও আপীল :

- (১) সম্পাদন অস্বীকার করার কারণ ছাড়া অন্য কোন কারণে সাব-রেজিস্ট্রার রেজিস্ট্রী অগ্রাহ্য করলে এবং সম্পাদন অস্বীকার করার কারণে রেজিস্ট্রী অগ্রাহ্য হলে, উক্ত অগ্রাহ্য আদেশ প্রদানের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে জেলা রেজিস্ট্রারের নিকট (যথাক্রমে ৭২ ও ৭৩ ধারা) আপীল আবেদন করা যেতে পারে।
- (২) অগ্রাহ্য আদেশের প্রথম অনুলিপি/নকল গ্রহণের জন্য কোন ফিস বা স্ট্যাম্পের প্রয়োজন হয় না।
- (৩) জেলা রেজিস্ট্রার আপীলের ক্ষেত্রে সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণপূর্বক রেজিস্ট্রীর জন্য আদেশ প্রদান করলে, উক্ত আদেশ দানের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সাব-রেজিস্ট্রারের নিকট উক্ত আদেশসহ দলিলটি রেজিস্ট্রীর জন্য পুনরায় দাখিল করতে হয় (৭৫ ধারা)।
- (৪) জেলা রেজিস্ট্রার রেজিস্ট্রী অগ্রাহ্য করলে জেলা রেজিস্ট্রারের আদেশের বিরুদ্ধে দেওয়ানী আদালতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে মামলা করা যায় (৭৭ ধারা)।
- (৫) দেওয়ানী আদালত রেজিস্ট্রীর আদেশ প্রদান করলে উক্ত আদেশ প্রদানের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট রেজিস্ট্রী অফিসে দলিলটি রেজিস্ট্রীর জন্য পুনরায় দাখিল করতে হয়।

রেজিস্ট্রেশন আইনের সীমাবদ্ধতা

রেজিস্ট্রেশন আইনের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এর মূল্যায়ন করতে হলে এ সমস্ত সীমাবদ্ধতা সম্পর্কেও সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন। এগুলো নিম্নরূপ :

- (১) দলিলের রেজিস্ট্রেশনই এর সম্পাদনের সন্দেহাতীত প্রমাণ নয় ;
- (২) শুধুমাত্র রেজিস্ট্রী হলেই কোন দলিল স্বত্বাধিকার প্রমাণ করবে না বা এর বিশ্বাসযোগ্যতাও প্রমাণিত হবে না ;
- (৩) কোন দলিল বে-আইনী বা প্রবঞ্চনামূলকভাবে তৈরী হলে কেবল রেজিস্ট্রেশন একে বিশুদ্ধতা প্রদান করতে পারবে না।

রেজিস্ট্রেশন আইনের রেজিস্ট্রীযোগ্য দলিলকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে—

(ক) স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত ও (খ) অস্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত। স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত দলিল ছাড়া অন্য সবরকম দলিলকে ব্যাপক অর্থে অস্থাবর সংক্রান্ত দলিল বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

উইল ব্যতীত স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত কোন দানপত্র, অন্য প্রকার দলিল, রশিদপত্র, লীজ দলিল বা কোর্টের ডিক্রি যা দ্বারা একশত বা তদূর্ধ্ব মূল্যের কোন স্থাবর সম্পত্তির শর্তসূচক বা কায়েমী অধিকার স্বত্তাগম, স্বার্থ-সুবিধা বর্তমানে বা ভবিষ্যতে সৃষ্টি করবে, জ্ঞাপন করবে, হস্তান্তর, সীমিত বা বিলোপ সাধন করবে, সে সমস্ত দলিলের রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক। তদুপরি উইল ছাড়া অন্যান্য কোন দলিল দ্বারা যদি কোন দত্তক গ্রহণের ক্ষমতা প্রদান করা হয় তার রেজিস্ট্রীও বাধ্যতামূলক। অন্যান্য সকল প্রকার দলিলের রেজিস্ট্রী বাধ্যতামূলক নয়। এ প্রসঙ্গে কিছু ব্যতিক্রম লক্ষ্যণীয়। সম্পত্তি হস্তান্তর আইন ১৮৮২-এর ৪ ধারায় আইনের ৫৪, ৫৯, ১০৭ ও ১২৩ ধারাকে রেজিস্ট্রেশন আইনের সম্পূরক বলে বলা হয়েছে। এই ধারা মতে কিছু কিছু দলিলের রেজিস্ট্রী বাধ্যতামূলক করা হয়েছে যদিও রেজিস্ট্রী আইনে এগুলো রেজিস্ট্রী বাধ্যতামূলক নয়। তদুপরি প্রজাস্বত্ব আইনের ৮৯ ধারায় ১০০ টাকার কম মূল্যের স্থাবর সম্পত্তির দলিল রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

অতএব দেখা যায় রেজিস্ট্রেশন আইনের ১৭ ধারায় বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত সকল প্রকার দলিলের (মূল্যমান নির্বিশেষে) রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক। ১৮৮২ সনে ট্রাস্ট আইনের ৫ ধারামতে অস্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত ট্রাস্ট দলিলের রেজিস্ট্রী বাধ্যতামূলক। আবার রেজিস্ট্রেশন আইনের ১৭ ধারা ও সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ১২৩ ধারা মতে স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত দান (উইল ব্যতীত) অবশ্যই রেজিস্ট্রীকৃত দলিল দ্বারা সম্পন্ন করতে হবে, অন্যথায় সিদ্ধ হবে না। কিন্তু মুসলমান আইন অনুসারে দান মৌখিকভাবে করারও বিধান আছে। এ ব্যক্তিগত আইনের বিধান সাধারণ আইনের উপর প্রবল থাকবে। অতএব দেখা যায় যে, প্রচলিত অন্যান্য আইনের যে সমস্ত বিধান রেজিস্ট্রেশন আইনের সম্পূরক বলে বলা হয়েছে, সে সমস্ত বিধান, দলিল রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য।

রেজিস্ট্রেশন আইনে রেজিস্ট্রী কর্মকর্তার ক্ষমতা

রেজিস্ট্রী কর্মকর্তার কার্যক্রমকে দণ্ডবিধির ২২৮ ধারা মোতাবেক জুডিসিয়াল কার্যক্রম বলে গণ্য করা হয়েছে। রেজিস্ট্রী আইনের ৪১ ধারার কার্যক্রমে সি. আর. পি. সি ১৯৫ ধারা অনুসারে রেজিস্ট্রী কর্মকর্তা কোর্ট। আইনে ৭৫ ধারার কার্যক্রম আধা-বিচারিক (Quasi-Judicial) ও ৮০ (৮) ধারায় রেজিস্ট্রী কর্মকর্তা সি. আর. পি. সি'র ৪৮০, ৪৮১ ধারা মতে কোর্ট হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। রেজিস্ট্রেশন আইনটি প্রকৃতিগতভাবে কিছু

কিছু ক্ষেত্রে বিচারিক (Substantive Judicial) হলেও সার্বিকভাবে রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়াটি আধা-বিচারিক (Quasi-Judicial)।

রেজিস্ট্রী কর্মকর্তাকে দলিল রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়ায় প্রশাসনিক ও বিচারিক উভয়বিদ দায়িত্ব পালন করতে হয়। রেজিস্ট্রেশন আইনের ৩৪ ও ৩৫ ধারায় রেজিস্ট্রী কর্মকর্তার অনুসন্ধানের ক্ষেত্র অত্যন্ত সীমিত। দলিলদাতা তার সামনে উপস্থিত হয়ে দলিল সম্পাদন স্বীকার করলে, উপযুক্তভাবে সনাক্ত হলে ও প্রচলিত অন্যান্য আইনের আনুষ্ঠানিকতা পালিত হলে সাব-রেজিস্ট্রার দলিলখানি রেজিস্ট্রী করতে বাধ্য। এ ক্ষেত্রে তার সুবিবেচনার কোন অবকাশ নেই। রেজিস্ট্রেশন আইনের ৩৫ ধারা সম্পর্কিত রেজিস্ট্রেশন বিধিমালার ৪২ নং বিধিতে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে, দলিলের বৈধতা পরীক্ষা করা সম্পূর্ণভাবে তার এখতিয়ার বহির্ভূত। কোন দলিলে বিক্রিত জমি, দাতার নিজের কিনা, তাতে তৃতীয় কোন ব্যক্তির স্বার্থহানি হবে কিনা, দলিলটা প্রবঞ্চনামূলক বা গণস্বার্থ বিরোধী কিনা, বা তাতে শান্তিভংগ হবে কিনা ইত্যাদি রেজিস্ট্রী কর্মকর্তার বিবেচ্য বিষয় নয়। এগুলো উপযুক্ত আদালতের বিচার ও সিদ্ধান্তের বিষয়। রেজিস্ট্রেশন সারগ্রন্থের ৬ষ্ঠ খণ্ডে মহা-পরিদর্শকের উপদেশ ও আদেশাবলীর ৯৯ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, কোন দলিলের বিষয়বস্তু নৈতিকতার পরিপন্থী বা নীতি বিগর্হিত হলে বা কোন শিশু কন্যাকে বেশ্যালেয়ে বিক্রি করা হলে বা কোন বে-আইনী শর্ত আরোপ করা হলেও রেজিস্ট্রী কর্মকর্তা দলিল রেজিস্ট্রী করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করতে পারবেন না। বরং এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তদন্ত ও ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রেজিস্ট্রারের কাছে রিপোর্ট পেশ করবেন। স্পষ্টত রেজিস্ট্রেশন আইনে বিবৃত পন্থায় যথাযথভাবে কোন দলিল উপস্থাপিত হলে কোন অজুহাতেই রেজিস্ট্রী কর্মকর্তা যাতে তা রেজিস্ট্রী করতে অস্বীকার না করেন সেজন্য কড়া সাবধানবাণী বারবার উচ্চারিত হয়েছে। রেজিস্ট্রেশন আইনের প্রধান উদ্দেশ্য হল জনসাধারণ কর্তৃক স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত যে-কোন আদান প্রদানের দলিল রেজিস্ট্রী করে তার রেকর্ড সংরক্ষণ ও জনসাধারণে প্রচারের সুযোগ সৃষ্টি। আইনের বিধান মতে দলিল রেজিস্ট্রী হলে তাতে কোন স্বত্ত্ব, স্বামীত্ব বা অধিকার সৃষ্টি হল কিনা তা সম্পূর্ণভাবে আদালতের বিবেচ্য বিষয়। সাব-রেজিস্ট্রার নিজে বিচারকের আসনে বসলে তাতে ক্ষমতা অপব্যবহার হবার, জনসাধারণের দুর্ভোগ বাড়ার ও রেজিস্ট্রেশনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবার সম্ভাবনা রোধ করার জন্যই রেজিস্ট্রী কর্মকর্তার ক্ষমতা সীমিত করা হয়েছে। দলিল রেজিস্ট্রী হলেই কেউ তা দিয়ে অন্যান্য সুযোগ লাভ করতে পারবে রেজিস্ট্রেশন আইন একরূপ ধারণাকেও বাতিল করেছে।

বিশেষ প্রতিকার আইনের ৩(গ) ও ৫০ (ঘ) ধারায় বলা হয়েছে যে, রেজিস্ট্রেশনের বিরুদ্ধে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অচল। হাইকোর্টের রুলিং অনুসারে উপযুক্ত ও বৈধভাবে দলিল রেজিস্ট্রীর জন্য উপস্থাপিত হলে রেজিস্ট্রী কর্মকর্তাকে তা রেজিস্ট্রী করা থেকে বিরত করা যাবে না এবং রেজিস্ট্রী কর্মকর্তার কার্যক্রম থেকে বিরত করার কোন এখতিয়ার আদালতের নেই।

বিধানসমূহ আপাতদৃষ্টিতে কঠোর মনে হলেও রেজিস্ট্রেশন আইনের উদ্দেশ্যের সংগে সংগতিপূর্ণ। এও বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে, রেজিস্ট্রেশন আইনের এ কঠোরতা জনকল্যাণে একে কার্যত অধিকতর সফল প্রমাণ করেছে।

ভূমি ব্যবস্থাপনা ও রেজিস্ট্রেশন আইন

১৭৯৩ সনের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থেকে ভূমি ব্যবস্থাপনার অভিযাত্রা আরম্ভ হয়েছে। কৃষি প্রধান এ দেশে ভূমি মালিকানার আভিজাত্য সনাতন বাংলার সমাজ ব্যবস্থার এক স্বীকৃত ধারণা। আজও আমরা কম-বেশী সকলে এ ব্যাপারে মোহাচ্ছন্ন। ভূমি মালিকানার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য এ যাবতকাল বহুবিধ আইন প্রণীত হয়েছে। তা সত্ত্বেও এ দেশের মামলা-মোকদ্দমা, ঝগড়া-কোন্দলের বেশীর ভাগই জমিজমাকে কেন্দ্র করে। তার কারণ আমাদের ক্রটিপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থার। এ দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠী মুসলমান উত্তরাধিকার আইনের উদারতার ফলে নিয়ত ভূমি মালিকানা পরিবর্তনের জটিলতা হাজার ডাল-পালায় বিস্তৃত হয়েছে। আর সম্ভবত এ কারণেই কোন জরীপই ভূ-সম্পত্তির মালিকনা নিরূপণে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে না। কাজটি সত্যিই জটিল। একটি কার্যকর ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থা কায়ম করার চিন্তা-ভাবনা চলছে নিরন্তর। কিন্তু আজও পূর্ণ সফলতা নিশ্চিত হয়নি। বর্তমানে ভূমি সংস্কারের চিন্তা-ভাবনা নতুন করে চলছে। কর্তৃপক্ষীয় সূত্রে জানা গেছে এ উদ্যোগ চলতে থাকলে আগামী ১৮ বছরের মধ্যে একটা কার্যকর ভূমি মালিকানা রেকর্ড নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। এ থেকে জটিলতার মাত্রা অনুমান করা যায়।

প্রাসংগিক কারণে প্রশ্ন এসেছে ভূ-সম্পত্তি হস্তান্তরের ফলে জটিলতা কতটা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সার্বিক জটিলতায় তার অবদান শতকরা কত ভাগ? বিষয়টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা দলিল রেজিস্ট্রী প্রক্রিয়ার সূচনা-লগ্ন থেকেই চলে আসছে। ভূ-সম্পত্তির হস্তান্তর দলিলের রেজিস্ট্রীর জন্য ১৯৫০ সনের প্রজাস্বত্ব আইনের ৮৯ ধারার বিধান মতে বাধ্যতামূলকভাবে হস্তান্তর নোটিশ প্রদান করতে হয়। এ নোটিশের ফলে হস্তান্তরিত জমির নামজারী ও মিউটেশন করার কথা। কিন্তু কার্যত তা খুব কম ক্ষেত্রেই হয়েছে। ভূমি প্রশাসনের মতে এ সমস্ত নোটিশ তথ্যবহুল ও সুখপাঠ্য না হওয়ায় কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া যাচ্ছে না। অভিযোগটি সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য নয়। এ ব্যাপারে ইতিমধ্যে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। নোটিশ যাতে তথ্যবহুল, সুখপাঠ্য হয় এ ব্যাপারে রেজিস্ট্রী কর্মকর্তাগণ অত্যন্ত সজাগ। ভূমি প্রশাসন ও রেজিস্ট্রী কর্মকর্তাগণ এ ব্যাপারে আন্তরিক না হলে এ অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগ চলতেই থাকবে। তার সমাধান বিকল্প কোন চিন্তা ভাবনা করে করা যাবে না। এক হাতে জমি হস্তান্তরের দলিল রেজিস্ট্রেশন ও মিউটেশনের দায়িত্ব দেয়া হলে অবস্থার আরও অবনতি ঘটিবে ও জনসাধারণের দুর্ভোগ বাড়বে। কারণ নামজারী ও দলিল রেজিস্ট্রী তখনই এক সাথে সম্ভব যখন নির্ভুলভাবে এ

দেশের সমস্ত ভূ-সম্পত্তির মালিকানা রেকর্ড করা সম্ভব হবে। বর্তমান অবস্থাতে রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া থেকে জনসাধারণ তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে যে সুবিধা পাচ্ছে তা ব্যাহত হলে সার্বিক অবস্থা আরও জটিল হবে। রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া নিবন্ধের শুরুতে বর্ণিত উদ্দেশ্যে চালু হয়েছে এবং রেজিস্ট্রেশন আইন প্রণয়নকালে ভূমি ব্যবস্থাপনার জটিলতাও বিবেচ্য ছিল। প্রশাসনকে একীভূত করার চিন্তা তখন ছিল না। কারণ দলিল শুধু জমি-জমা হস্তান্তর ছাড়াও বহুবিধ কারণে প্রণীত হয়। ভূমি সংস্কারের সহায়তার জন্য ১৯৭২ সনে রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১৪২-এর মাধ্যমে ৬ দফা সম্বলিত হলফনামা বাধ্যতামূলকভাবে জমি-জমার হস্তান্তর দলিলের সংগে সংযোজনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। জাল-জালিয়াতি রোধের জন্য রেজিস্ট্রেশন আইনের ২৮ ধারা সংশোধন ও ৩০ ধারা বাতিল করা হয়েছে। তা অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়েছে। রেজিস্ট্রী আইন বা রেজিস্ট্রেশন বিভাগ ভূমি সংস্কারে কোন জটিলতা সৃষ্টি করেনি।

রেজিস্ট্রেশন আইনের সাথে অন্যান্য আইনের সম্পর্ক

রেজিস্ট্রেশন আইনের সাথে মোটামুটিভাবে সাধারণ দফা আইন (General Clauses Act), সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, চুক্তি আইন, অছি আইন (Jrust Act), সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন (Specific Relief Act), সাবালকত্ব আইন, জমিদারী দখল ও প্রজাস্বত্ব আইন, আয়কর আইন, সমবায় আইন ও দেওয়ানী কার্যবিধির কতিপয় বিধানের সম্পর্ক রয়েছে। রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়ায় উল্লেখিত আইনের সংশ্লিষ্ট বিধানের সাহায্য গ্রহণ করতে হয়।

রেজিস্ট্রেশন আইনের পরিধি

সাবেক পার্বত্য চট্টগ্রাম অর্থাৎ বর্তমান প্রশাসনিক জেলা বান্দরবন, খাগড়াছড়ি ও রাংগামাটি ব্যতীত সারা দেশে এই রেজিস্ট্রেশন আইন বলবৎ রয়েছে।

রেজিস্ট্রেশন বিভাগের অবকাঠামো

পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্যতীত সারা দেশের ভৌগোলিক সীমারেখাকে ৪৯টি রেজিস্ট্রীকরণ জেলায় বিভক্ত করা হয়েছে। দেশের থানা পর্যায়ে সর্বমোট ৪৭৫টি উপ-রেজিস্ট্রারের অফিস রয়েছে। ২২টি থানায় একের অধিক অফিসও রয়েছে। উপ-রেজিস্ট্রারের অফিসগুলোই রেজিস্ট্রীকরণের মূল ইউনিট হিসেবে পরিগণিত। রেজিস্ট্রীকরণের সামগ্রিক প্রক্রিয়া সাব-রেজিস্ট্রারের অফিসেই নিষ্পন্ন হয়। জেলা রেজিস্ট্রারগণ অধঃস্তন কর্মকর্তাদের নিয়ন্ত্রণ, অধঃস্তন অফিস পরিদর্শন, তত্ত্বাবধান ও সাব-রেজিস্ট্রারের বিতর্কিত আদেশের আপীল কর্তৃপক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

এ ছাড়া রেজিস্ট্রেশন বিভাগের সামগ্রিক প্রশাসনের দায়িত্ব রয়েছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনাধীন রেজিস্ট্রী পরিদপ্তর।

রেজিস্ট্রেশন পরিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো

মহা-পরিদর্শক

সহকারী	পরিদর্শক	প্রশাসনিক	প্রধান	উচ্চমান	নিম্নমান	অন্যান্য	
মহা-পরিদর্শক-১	- ২	কর্মকর্তা-১	সহকারী-১	সহকারী-৬	সহকারী-১২	২৮	
জেলা রেজিস্ট্রার			সাব-রেজিস্ট্রার				
প্রধান	নিম্নমান	টি, সি,	অন্যান্য	নিম্নমান	মোহারার	টি, সি,	
সহকারী-১	সহকারী-১	সহকারী-১	-৩	সহকারী-১	-১	মোহারার-১	পিয়ন-১

বাংলাদেশের রেজিস্ট্রীকরণ পদ্ধতি ও আনুষংগিক বিষয়াদি আধুনিকায়ন প্রসঙ্গে

১৯০৮ সনে প্রণীত রেজিস্ট্রেশন আইন ও প্রচলিত রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়ার কার্যকারিতা ও পশ্চাদপদতা সম্পর্কে প্রায়ই প্রশ্ন তোলা হয়। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে ও ভূমি ব্যবস্থাপনার আলোকে এ আইনটির ও প্রক্রিয়ার কিছু আধুনিকায়ন হওয়া দরকার।

রেকর্ড সংরক্ষণ

দলিল রেজিস্ট্রীকরণের পর এর সূচীকরণ সম্পূর্ণ করে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের জন্য দলিল সাব-রেজিস্ট্রী অফিস হতে জেলা সদর রেকর্ড রুমে পাঠিয়ে দেয়া রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতির একটা প্রধান অংগ। জনগণ তাদের চাহিদা অনুসারে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে থাকে।

বাংলাদেশে ৪৭৫টি সাব-রেজিস্ট্রী অফিস ও ৪৯টি জেলা রেজিস্ট্রী অফিস রয়েছে। ৪৭৫টি সাব-রেজিস্ট্রী অফিসের মধ্যে ১৬৫টি অফিস নিজস্ব ভবনে ও বাকী ৩১০টি অফিস ভাড়াটিয়া গৃহে অবস্থিত। ৪৯টি জেলা রেজিস্ট্রারের কার্যালয়ের মধ্যে ২২টি অফিস নিজস্ব গৃহে এবং বাকী ২৭টি অফিস ভাড়াটিয়া গৃহে অবস্থিত।

দেশের অধিকাংশ সাব-রেজিস্ট্রী অফিস গৃহ অত্যন্ত পুরাতন ও জরাজীর্ণ এবং প্রকট স্থানাভাবের দরুন সেগুলোতে পুঞ্জিভূত রেকর্ড-পত্র যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে না। অন্যদিকে পুরাতন জেলা সদর রেকর্ড রুমগুলোতে স্থানাভাবের দরুন এবং

নতুন সৃষ্ট জেলাগুলোতে এখনও জেলা রেজিস্ট্রারের অফিস ও রেকর্ড রুম নির্মিত না হওয়ায় মফঃস্বল অফিসগুলোর রেকর্ডসমূহ জেলা সদরে স্থানান্তরিত করা সম্ভব হচ্ছে না এবং নতুন জেলা সৃষ্টির সুযোগ হতে বঞ্চিত হচ্ছে। ইতিমধ্যে বহু অফিসের রেকর্ড নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। কাজেই বিভাগটির মফঃস্বল অফিসসমূহের উপযুক্ত গৃহায়ন এবং নবসৃষ্ট জেলাগুলোতে রেকর্ড রুমসহ জেলা রেজিস্ট্রারের কার্যালয় নির্মাণের ব্যাপারে একটি কার্যক্রম একান্তই আবশ্যিক এবং উক্ত কার্যক্রমের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন এবং দেশের সমস্ত রেজিস্ট্রী অফিস গৃহগুলোর যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের স্বার্থে একটি বিভাগীয় প্রকৌশলীর পদ সৃষ্টির বিষয়টিও বোধ হয় বিশেষভাবে বিবেচনার যোগ্য। কেননা গণপূর্ত বিভাগের নিকট হতে এ বিভাগের অফিস গৃহগুলোর একান্ত প্রয়োজনীয় সংস্কারের বিষয়ে সবসময়ে সময়মত এবং আশানুরূপ সাড়া ও সহযোগিতা পাওয়া যায় না।

রেকর্ড সংরক্ষণ ব্যবস্থায় মাইক্রোফিসের প্রচলন অবশ্যই সর্বাধুনিক প্রযুক্তি। প্রায় ৫০ বৎসর কাল সময়ের রেকর্ড থেকে জনগণ সাধারণত বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে থাকে। ৫০ বছরের পূর্বের যে সমস্ত রেকর্ড রয়েছে তা মাইক্রোফিসের সাহায্যে সংরক্ষণ করে রাখলে আরও দীর্ঘদিন ধরে এর ব্যবহার সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় এবং তা ধ্বংসের হাত হতে রক্ষাও পেতে পারে। মাইক্রোফিসের মাধ্যমে ৫০ বছরের অধিককালের রেকর্ডগুলো সদর রেকর্ড রুম হতে সরিয়ে নিলে ঐ স্থানে নতুন রেকর্ড সংরক্ষণের ব্যবস্থা হবে, যার দ্বারা বর্তমান সমস্যার আশু সমাধান হবে।

দলিল লেখন পদ্ধতি সহজীকরণ

বর্তমান দলিল লেখন পদ্ধতি আধুনিক, গতিশীল এবং সহজ নয় বলে মনে হয়। বর্তমানে কিছু লীজ, আমোক্তারনামা এবং ব্যাংকের মর্টগেজ দলিলের ক্ষেত্রে নির্ধারিত ফরম ব্যবহৃত হলেও অন্যান্য প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রে দলিল লেখকগণের হাতের লেখা দলিল রেজিস্ট্রীর জন্য গৃহীত হয়ে আসছে। ঐগুলোর মধ্যে স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত অনেক দলিলের কলেবর প্রায়শই বেশ স্ফীত থাকে। অনেকে তা অপ্রয়োজনীয় মনে করেন এবং আধুনিক, গতিশীল ও সহজীকরণের লক্ষ্যে সংক্ষিপ্ত এবং ছাপানো ফরমে হওয়া উচিত বলে মত পোষণ করেন। প্রকৃতপক্ষে এরূপ মত যে সঠিক এবং বাস্তবসম্মত নয় তা অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করে থাকেন। স্ট্যাম্প আইনের ১ নং তপসীতে ৬৫ রকম দলিলের বর্ণনা আছে। দলিলের ভিন্নতা, অর্জিত স্বত্বের বর্ণনার বৈচিত্র্য, দাতা-গ্রহীতার সংখ্যাধিক্য ও হস্তান্তরিত জমির সুদীর্ঘ বর্ণনার ক্ষেত্রে একই ধরনের ছাপানো ফরম প্রয়োগ বাস্তব ক্ষেত্রে প্রায় অসম্ভব। কাজেই দলিল লেখন পদ্ধতিটিকে আধুনিক, গতিশীল ও সহজীকরণের লক্ষ্যে সমস্ত প্রকার দলিলই নির্ধারিত ফরমে লেখার নিয়ম বা বিধি প্রবর্তনের তেমন অবকাশ আছে বলে মনে হয় না। তবে সুস্পষ্ট লেখা, সহজবোধ্যভাবে এবং নির্ভুল ভাষায় দলিল লেখন পদ্ধতিটির উৎকর্ষতার লক্ষ্যে দলিল

লেখকদের যোগ্যতা সম্পর্কে পরীক্ষা গ্রহণের নিয়ম প্রবর্তনের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

দলিল লেখকের সনদের জন্য আবেদনকারীকে অবশ্যই মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পাশ হতে হবে এবং উক্ত সনদ লাভের যোগ্যতা অর্জনের জন্য অনুষ্ঠিত লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। উক্ত পরীক্ষা নির্ধারিত সিলেবাস অনযায়ী রেজিস্ট্রী পরিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে প্রতি বৎসর নির্দিষ্ট সময় ও স্থানে অনুষ্ঠিত হবে।

এ পদ্ধতি কার্যকরী করার জন্য দলিল লেখক নিয়োগ সংক্রান্ত নিয়ম বিধি প্রণয়ন করতে হবে।

দলিল ফেরৎ দেয়ার ব্যবস্থা সহজীকরণ ও নামজারীর আশু ব্যবস্থা

বর্তমানে প্রচলিত দলিল রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া আধুনিকায়নের জন্য দলিল রেজিস্ট্রীর সময় দলিলের সংগে সংশ্লিষ্ট পক্ষের খরচে সরকারের নিযুক্ত নকল নবীশ প্রস্তুত সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে এর তিনটি প্রতিলিপি দাখিল করার বিধান রাখা যেতে পারে। প্রতিলিপিটির পৃষ্ঠাসমূহ বালামের পৃষ্ঠার ছকে ও পরিমাপে তৈরী হবে। মূল দলিলটি রেজিস্ট্রীর জন্য গ্রহণ করার পর প্রতিলিপির সংগে সামঞ্জস্য সাধন করে রেজিস্ট্রী কার্য সম্পন্ন করার পর স্বল্প সময়ের মধ্যে পক্ষকে ফেরৎ দেয়া হবে এবং প্রতিলিপিটি আনুষঙ্গিক কার্যাদি সম্পন্ন করার পর বালামের আকারে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করা হবে। তৃতীয় প্রতিলিপিটি নামজারীর জন্য সহকারী কমিশনার (ভূমি)/থানা রাজস্ব অফিসারের নিকট পাঠিয়ে দিতে হবে এবং সহকারী কমিশনার (ভূমি) তা প্রাপ্তির পর আইনে বর্ণিত নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে নামজারী করবেন। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সাব-রেজিস্ট্রার দলিলের প্রতিলিপি সহকারী কমিশনার (ভূমি)/উপজেলা রাজস্ব অফিসারের কাছে না পাঠালে এবং সহকারী কমিশনার (ভূমি)/উপজেলা রাজস্ব অফিসার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নামজারী না করলে আইনগতভাবে শাস্তির ব্যবস্থা করা। পদ্ধতিটি রেজিস্ট্রেশন আইনের সামান্য সংশোধনের পর চালু করা যেতে পারে। এবং অনুরূপ একটি প্রক্রিয়া বর্তমান বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে অতি সহজে চালু করা সম্ভব হবে। এ ক্ষেত্রে দলিল লেখকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ন্যূনপক্ষে এস, এস, সি, পাশ নির্ধারণ করে তাদের সনদ প্রদানের ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে প্রক্রিয়াটির প্রচলন সহজসাধ্য হবে। ১৯৭৮ সন পশ্চিমবংগে দলিল রেজিস্ট্রীর এই প্রক্রিয়া চালু করেছে।

পরিবর্তিত প্রক্রিয়ায় রেজিস্ট্রেশন আইনের ৮৯ ধারায় নূতন বিধান সংযোজনপূর্বক “অবিকল নকল প্রণয়ন রীতি” ও “দলিল ফাইলকরণ রীতি” ২টি নিয়মাবলী আইনসিদ্ধ করে প্রবর্তন করতে হবে এবং এতে রেজিস্ট্রেশন আইনের বর্তমান ১৯, ৪৫, ৪৬, ৫১, ৫২, ৫৪, ৫৫, ৫৭, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৪, ৬৫, ৬৬ (৪) ধারাসমূহ উপযুক্তভাবে সংশোধন করতে হবে।

প্রস্তাবিত প্রক্রিয়ায় দলিল ফাইলকরণের নিমিত্তে বিভিন্ন ক্রমিক তারিখ যুক্ত বহির ফাইলসমূহ বাঁধাইপূর্বক স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করতে হবে। এ ব্যবস্থা প্রয়োগের ফলে যদি কোন নকল নবীশ কর্মচ্যুত হয়, তবে তাদের কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। এ ব্যবস্থা রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়াকে সহজতর ও গতিশীল করবে।

ভূয়া মালিক কর্তৃক জমি হস্তান্তর ও জাল-জালিয়াতি প্রসংগে

বর্তমানে সারা দেশে ৪৭৫টি সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে বছরে প্রায় ৪০ থেকে ৪২ লক্ষ দলিল রেজিস্ট্রি হয়ে থাকে। সংখ্যানুপাতে জাল-জালিয়াতির হার অত্যন্ত নগণ্য। তদুপরি জাল-জালিয়াতি রোধ করার জন্য রেজিস্ট্রেশন আইনের ২৮ ধারা সংশোধনপূর্বক রেজিস্ট্রি কর্মকর্তার অধিক্ষেত্রে সীমিত করা হয়েছে এবং রেজিস্ট্রেশন আইনের ৩০ ধারা রদ করে জেলা রেজিস্ট্রারের রেজিস্ট্রি করার ক্ষমতা সংহরণ করা হয়েছে। এ ব্যবস্থা গ্রহণ করার ফলে জাল-জালিয়াতি আরও অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে।

তথাপি জাল-জালিয়াতি যে হয় না তা বলা যায় না। যে-সব ক্ষেত্রে জালিয়াতি হয় তা প্রদর্শনপূর্বক এর প্রতিকারের সুপারিশ নিম্নে দেয়া হল :

(১) অনেকে মনে করেন সাব-রেজিস্ট্রার হস্তান্তরিত জমির মালিকানা যাচাই না করার দরুন অনেক ভূয়া মালিকও দলিল রেজিস্ট্রি করতে পারে।

এ প্রশ্নের জবাবে বলা যায় যে, রেজিস্ট্রেশনের উদ্দেশ্যে জমি-জমা আদান-প্রদানের প্রামাণিক নিদর্শন সৃষ্টি, যা বিদ্যমান ভূমি ব্যবস্থাপনার জটিলতার মাঝে জনগণের রক্ষাকবচ।

রেজিস্ট্রেশন আইনের ৪৭ ধারার বিধান মতে দলিলের কার্যকারিতা দলিল সম্পাদনের তারিখ হতেই আরম্ভ হয়। কিন্তু আইনের ২৩ ধারার বলে দলিলটি সম্পাদনের তারিখ থেকে ৪ মাসের মধ্যে যে-কোন সময় রেজিস্ট্রির জন্য উপস্থাপন করা যেতে পারে। কাজেই হস্তান্তর কার্যকর হওয়ার পর পূর্ব-স্বত্ব যাচাইয়ের কোন গুরুত্ব থাকে না। সংগত কারণেই অনুরূপ কোন এখতিয়ার সাব-রেজিস্ট্রারকে দেয়া হয় নাই। দলিল সম্পাদনকারী সম্পাদন স্বীকার করলে ও প্রচলিত অন্যান্য আইনগত আনুষ্ঠানিকতা পালন করা হলে সাব-রেজিস্ট্রার দলিল রেজিস্ট্রি করতে বাধ্য। রেজিস্ট্রেশন আইনের ৩৪ ও ৩৫ ধারায় ও বিধিমালার ৪২ ধারায় অনুরূপ নির্দেশনাই রয়েছে। সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ৩ ধারা মতে ক্রেতা সম্পত্তির স্বত্ব ও বিক্রয়-পূর্ব অবস্থা অবগত আছেন এ ধারনাই সমর্থন করে। সাব-রেজিস্ট্রার রেজিস্ট্রেশন আইনের ২১ ধারা মতে হস্তান্তরিত জমির বর্ণনা পরীক্ষা করেন। ভূমি ব্যবস্থাপনার জটিলতা ও উত্তরাধিকার আইনের নিরিখে হস্তান্তরিত সম্পত্তির পূর্ব-স্বত্ব যাচাই এক জটিল প্রক্রিয়া। বিতর্কিত ক্ষেত্রে সম্পত্তির স্বত্ব যাচাই একমাত্র আদালতেরই এখতিয়ারভুক্ত বিষয়। এরূপ পূর্ব-স্বত্ব

যাচাই করার দায়িত্ব সাব-রেজিস্ট্রারকে প্রদান করলে দলিল রেজিস্ট্রী বিলম্বিত ও অনিশ্চিত হবে। দুর্নীতি ও জনগণের হয়রানী বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এর ফলে রেজিস্ট্রেশনের আসল উদ্দেশ্য ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

সাব-রেজিস্ট্রার কর্তৃক হস্তান্তরিত জমির পূর্ব-মালিকানা পরীক্ষা করা ছাড়া নিম্নলিখিতভাবে ভূয়া মালিক কর্তৃক জমি হস্তান্তর ও জাল-জালিয়াতি রদ করা যায় :

(ক) দলিলদাতাকে সনাক্তকরণ পদ্ধতি সংশোধন করে এক্ষেত্রে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে দলিলদাতার ফটো দলিলের সংগে সংযোজন করার কথা। দলিলদাতার ফটো দেয়ার ব্যবস্থা চালু করলে জাল-জালিয়াতি ধরা পড়বার ভয়ে কেউ ভূয়া দলিল করতে সাব-রেজিস্ট্রী অফিসে আসবে না।

(খ) ভূমি হস্তান্তর দলিল রেজিস্ট্রীর সময় আয়কর পরিশোধ সার্টিফিকেটের ন্যায় ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের দাখিলা ব্যতিরেকে জমি রেজিস্ট্রী না করার বিধান করা। এতে একদিকে উন্নয়ন কর আদায় বৃদ্ধি পাবে অন্যদিকে দাতার মালিকানা স্বত্ত্ব কিছুটা যাচাই করা হবে।

(গ) ১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির ১৪২ নং আদেশ মতে দাতাকে এ মর্মে হলফনামা দিতে হয় যে, তার দলিলে বর্ণিত জমি হস্তান্তর করার পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে। এই হলফ নামা দলিলের অংশ হিসেবে গণ্য হয়। রাষ্ট্রপতির এই আদেশের কোন রুলস করা হয়নি। এই আদেশের রুলস প্রণয়ন করে তাতে যদি ভূয়া দাতাকে কঠোর শাস্তি দেয়ার বিধান করা যায় তবে জাল-জালিয়াতি অনেকাংশে কমে যাবে।

(ঘ) রেজিস্ট্রী আইনের ৩৪(৩) (বি) ধারায় দলিলদাতার সঠিক পরিচিতি সম্বন্ধে রেজিস্ট্রী কর্মকর্তাকে সন্তুষ্ট হতে বলা হয়েছে। বর্তমানে দলিলদাতা তার স্বগ্রামস্থ একজন দস্তখত জানা ব্যক্তি দ্বারা সনাক্ত হলে রেজিস্ট্রী কর্মকর্তা দাতার পরিচিতি সম্পর্কে সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন।

রেজিস্ট্রী বিধিতে যদি এরূপ নিয়ম চালু হয় যে, দলিলদাতার সনাক্তকারী লাইসেন্স প্রাপ্ত দলিল লেখক/এ্যাডভোকেট/রেজিস্ট্রী কর্মকর্তার পরিচিত ব্যক্তি হতে হবে, তাহলে জাল দলিলের সংখ্যা হ্রাস পাবে বলে আশা করা যায়।

(ঙ) দেখা যায় ভূয়া ব্যক্তি মালিক সেজে খাস ও অর্পিত সম্পত্তি হস্তান্তর করে নিরীহ লোককে হয়রানী করে।

এ ক্ষেত্রে যদি দাতাকে দলিলের সংগে তার ফটো দেয়ার ব্যবস্থা করা যায় তবে জাল-জালিয়াতি অনেকাংশে হ্রাস পাবে।

১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির ১৪২ নং আদেশ মতে দাতাকে এ মর্মে হলফ করতে হয় যে, দলিলের তপসিলে কোন পরিত্যক্ত ও খাস সম্পত্তি যুক্ত করা হয়নি। রাষ্ট্রপতির এই আদেশের রুলস প্রণয়ন করে যদি তাতে মিথ্যা হলফনামা দেয়ার জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা যায় তবে এ ক্ষেত্রে জাল-জালিয়াতি কমে যাবে।

তদুপরি খাস জমি ও অপরিত সম্পত্তির একটি তালিকা যদি স্ব স্ব সাব-রেজিস্ট্রারকে প্রদান করে ঐ তালিকার জমি রেজিস্ট্রী না করার বিধান করা যায় তবে এ ক্ষেত্রেও আকাংক্ষিত ফল পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

ম্যারিজ রেজিস্ট্রীকরণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন

পূর্বে ম্যারিজ রেজিস্ট্রারগণ ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হতেন, এবং বর্তমানে আইন ও বিচার মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত হন। ম্যারিজ রেজিস্ট্রারগণ কমিশনের ভিত্তিতে বিবাহ রেজিস্ট্রী করে থাকেন। নিয়মানুসারে ম্যারিজ রেজিস্ট্রারগণের সাব-রেজিস্ট্রী অফিসের ন্যায় ম্যারিজ রেজিস্ট্রী করে সে সকল রিপোর্ট, ইনডেক্স ইত্যাদি রেকর্ড-পত্র জেলা রেজিস্ট্রারের নিকট পাঠাতে হয়। আইনের শিথিলতা থাকার দরুন তারা ম্যারিজ রেজিস্ট্রীর ক্ষেত্রে অনেক অনিয়ম করে। ম্যারিজ রেজিস্ট্রী সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার ও আধুনিকায়নের প্রচলিত আইনের সংশোধন হওয়া দরকার এবং তাদের সুষ্ঠু তদারকীর জন্য রেজিস্ট্রেশন পরিদপ্তরে একজন সহকারী মহা-পরিদর্শক এবং দুইজন পরিদর্শকের পদ সৃষ্টি হওয়া দরকার।

বাংলাদেশের রেজিস্ট্রীকরণ পদ্ধতির আধুনিকায়ন প্রসঙ্গে কিছু আনুষঙ্গিক সুপারিশ

(ক) পূর্বের চেয়ে দলিল রেজিস্ট্রীর সংখ্যা অনেক গুণ বেড়ে গিয়েছে। ফলে কাজকর্মের সংখ্যাও অনেক গুণ বেড়েছে। পূর্বে জেলা রেজিস্ট্রী অফিস ছিল ১৯টি, বর্তমানে তা বেড়ে ৪৯টি হয়েছে। ইদানিং সাব-রেজিস্ট্রী অফিসও কিছু বেড়েছে। তাই রেজিস্ট্রেশন পরিদপ্তরের কাজকর্ম সুষ্ঠু তদারকীর জন্য ৪টি বিভাগে চারজন উপমহা-পরিদর্শকের পদ এবং তাদের সাহায্য করার জন্য কিছু কর্মচারীর পদ সৃষ্টি করা দরকার। প্রতি বিভাগে একজন করে উপমহা-পরিদর্শকের পদ সৃষ্টি করলে একদিকে যেমন কাজের সুষ্ঠু তদারকী হবে এবং অন্যদিকে সাব-রেজিস্ট্রার, জেলা রেজিস্ট্রার, পরিদর্শক ও সহকারী মহা-পরিদর্শকের পদোন্নতির সুযোগ হবে এবং তদ্বারা প্রশাসন আরও গতিশীল হবে।

(খ) সাব-রেজিষ্ট্রারের পদটি বহুদিনের পুরানো একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ। তাদের পদমর্যাদা এবং বেতনক্রম সরকারের উপজেলা পর্যায়ের নূতন নূতন অনেক বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নীচে। প্রশাসনকে গতিশীল করার জন্য বাংলাদেশ রেজিস্ট্রেশন সার্ভিসকে ক্যাডার সার্ভিসে অন্তর্ভুক্ত করা দরকার এবং সাব-রেজিষ্ট্রারের পদটিকে প্রথম শ্রেণীর পদমর্যাদাসম্পন্ন করা দরকার। তদ্রূপ জেলা রেজিষ্ট্রারের পদটিও জেলার অন্যান্য অফিসারের ন্যায় সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

(গ) সাব-রেজিষ্ট্রার ও জেলা রেজিষ্ট্রারের অফিসের আসবাবপত্র খুবই জীর্ণশীর্ণ ও অপ্রতুল। সাব-রেজিষ্ট্রার অফিসের মূল্যবান ভলিউম রাখার ব্যাক ও আসবাবপত্রের আরও উন্নতি হওয়া দরকার। সরকারী ফরম ও মনিহারী দ্রব্যাদিরও নিয়মিত সরবরাহ করা দরকার।

রেজিস্ট্রেশন প্রশিক্ষণ একাডেমী

রেজিস্ট্রেশন পরিদপ্তরের কর্মকর্তা, কর্মচারী, নকল নবীশ ও দলিল লেখকদের রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি, কাজকর্ম ইত্যাদির ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য একটা রেজিস্ট্রেশন প্রশিক্ষণ একাডেমী প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।

রেজিস্ট্রেশন পরিদপ্তর দুশ বছরের পুরাতন একটি পরিদপ্তর। এই বিভাগের অধীন কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ গতানুগতিকভাবে কাজ করে অভ্যস্ত। তাদের কার্যপদ্ধতি ও কাজের মান উন্নত করার জন্য একটা ট্রেনিং একাডেমী একান্ত দরকার।

তাছাড়া এই পরিদপ্তরের অধীনে রয়েছে প্রায় ছয় হাজার নকল নবীশ ও লক্ষাধিক দলিল লেখক। বালাম লেখার পদ্ধতি এবং দলিল লেখার ভাষা ও ধরন উন্নত করার জন্য তাদের মাঝে ট্রেনিং দেয়ার প্রয়োজন। প্রস্তাবিত ট্রেনিং একাডেমীতে তাদের মাঝে মাঝে ট্রেনিং দিলে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে এবং তাদের বালাম ও দলিলের ধরন উন্নত হবে।

এই একাডেমীতে একটি ‘গবেষণা সেল’ থাকলে পরিদপ্তরের বিভিন্ন সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা গবেষণার মাধ্যমে সমাধান করে আধুনিক প্রযুক্তি এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি কাজে লাগিয়ে রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতিকে আরও আধুনিকায়ন করা সম্ভব হবে।

দলিল নকলের রেজিষ্ট্রার ও সূচীবহি প্রসঙ্গে

দলিল সম্পাদন ও রেজিষ্ট্রার পর তা রেজিষ্ট্রার ভলিউমে তুলে এবং সূচীকরণ করে দ্রুত ক্রেতার হাতে দলিলটির আসল কপি পৌঁছে দেয়া এবং ভলিউম ও সূচী-রেজিষ্ট্রার স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করা রেজিষ্ট্রার বিভাগের একটি বড় কৃতিত্ব।

আজকাল ফরম বিভাগ কর্তৃক রেজিস্ট্রার ভলিউম ও সূচী-রেজিস্ট্রার সময়মত সরবরাহ না করার দরুন অনেক সময় নকল নবীশ বেকার বসে থাকে এবং নকলের জন্য দলিলের সংখ্যা বাড়তে থাকে। ফলে রেজিস্ট্রী বিভাগ সময়মত ক্রেতার হাতে দলিল ফেরৎ দিতে পারে না এবং সাধারণ কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়।

বর্তমানে রেজিস্ট্রার ভলিউম ও সূচী বহিসমূহের কাগজ, মলাট এবং বাঁধাই এতই নিম্নমানের যে খুব অল্প দিনের মধ্যেই এগুলোতে লেখা চিপসে এবং বাঁধাই খুলে যায়। তাছাড়া মলাটের দাগ লেগে উভয়দিকের ২/৩টি করে পাতার লেখা অস্পষ্ট হয়ে পড়ে। ফলে জনগণের স্বাবর-অস্বাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত এ সুমস্ত রেকর্ডের এরূপ অবস্থা তাদের স্বার্থ নানাভাবে বিঘ্নিত এবং ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই রেজিস্ট্রেশন আইনের জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট এই বিষয়টির উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণকে সহজসাধ্য এবং নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বি. জি. প্রেস হতে উন্নতমানের কাগজ, মলাট ও বাঁধাই করা রেজিস্ট্রার ভলিউম ও সূচী-বহির নিয়মিত এবং প্রয়োজনীয় সরবরাহের ব্যাপারে যথোচিত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ অত্যন্ত জরুরী এবং অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

জেলা রেজিস্ট্রারের কার্যালয়ে ফটোকপি মেশিন স্থাপনের সুপারিশ

প্রতিটি জেলা রেজিস্ট্রারের অফিসের সাথে জেলা সদর সাব-রেজিস্ট্রী অফিস সংযুক্ত থাকে। এ সমস্ত অফিসগুলোতে অন্যান্য অফিসের চেয়ে দলিল রেজিস্ট্রার সংখ্যা বেশি। বর্তমানে ক্রেতাগণ দলিল রেজিস্ট্রার সাথে সাথেই এর একটি সার্টিফাইড কপি নিতে চায়। সীমিত নকল নবীশগণকে একই সংগে দলিল নকলের কাজ ও ক্রেতাকে সার্টিফাইড কপি দিতে হয়। ফলে একদিকে দলিল নকলের কাজ বিলম্বিত হচ্ছে, অন্যদিকে সার্টিফাইড কপি পাওয়ার জন্য জনগণ দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন।

তাছাড়া জেলা রেজিস্ট্রারের অফিসের সংগে জেলা সদর রেকর্ড রুম থাকে যেখানে শত বছরের উর্ধের নানাবিধ রেকর্ডপত্র রয়েছে। ঢাকা সদর রেকর্ড রুমে বর্তমানে ১,২৫,৫১২ খানা বালাম বহি, ১৮,৩২০ খানা সূচী রেজিস্ট্রার, ১৩,১৮০ খানা টিপ বহি, ৬১০ খানা ক্যাটালগ রেজিস্ট্রার একুনে ১,৫৭,৬২২ খানা রেজিস্ট্রার রয়েছে। বাংলাদেশের পুরাতন জেলাগুলোতে প্রায় এই সংখ্যার কাছাকাছি রেজিস্ট্রার রয়েছে। জনগণ প্রতিনিয়ত তাদের চাহিদা অনুসারে সদর রেকর্ডক্রম হতে প্রয়োজনীয় তথ্যের আবেদন জানায়।

পুরাতন জেলা রেজিস্ট্রারের অফিসে একটি ফটোকপি মেশিন স্থাপন করলে জনগণকে তাদের চাহিদা অনুসারে সস্তার সার্টিফাইড কপি সরবরাহ করা সম্ভব হবে। এতে একদিকে জনগণের চাহিদা পূরণ হবে এবং অন্যদিকে সরকারী আয় বৃদ্ধি পাবে। বর্তমানে বেশীর ভাগ বকেয়া নকলের কাজ সদর সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে জমে আছে, ফটোকপি মেশিন স্থাপনের ফলে দলিল নকলের বকেয়া কাজ সম্পন্ন হবে। ফলে জনগণ স্বল্প সময়ের মধ্যে তাদের আসল দলিল ফেরৎ পাবেন।

দলিলে জমির মূল্য কম দেখানোর প্রবণতা রোধকরণ

রেজিস্ট্রিকরণ পদ্ধতি মূলত সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় চাহিদার আলোকেই প্রবর্তিত হয়। রাষ্ট্রের উন্নয়নমূলক চাহিদা মিটাতে রেজিস্ট্রি বিভাগ সরকারের রাজস্ব আদায়ের এক বিরাট উৎস।

রেজিস্ট্রি পরিদপ্তরের কয়েক বৎসরের আয় নিম্নরূপ :

রেজিস্ট্রেশন বিভাগে গত ১০ বছরে বিভিন্ন খাতের আয় নিম্নরূপ :

বৎসর	১০-রেজিস্ট্রিকরণ	১% অতিঃ কর	মোট
১৯৭৯-৮০	২৭,০১,৬৭,৮৪৪/- টাকা	—	২৭,০১,৬৭,৮৪৪/- টাকা
১৯৮০-৮১	২৩,৪৫,৮৭,৮৭১/- টাকা	—	২৩,৪৫,৮৭,৮৭১/- টাকা
১৯৮১-৮২	২৭,৯২,৫৮,১৪৪/- টাকা	—	২৭,৯২,৫৮,১৪৪/- টাকা
১৯৮২-৮৩	২৮,৭৭,৮১,৪৩২/- টাকা	—	২৮,৭৭,৮১,৪৩২/- টাকা
১৯৮৩-৮৪	৩১,৮১,৯৭,৭৪৭/- টাকা	—	৩১,৮১,৯৭,৭৪৭/- টাকা
১৯৮৪-৮৫	৩৯,৯৪,৫২,১৭০/- টাকা	—	৩৯,৯৪,৫২,১৭০/- টাকা
১৯৮৫-৮৬	৪৩,৩৯,৪০,০৯৬/- টাকা	—	৪৩,৩৯,৪০,০৯৬/- টাকা
১৯৮৬-৮৭	৪৮,৮৫,৫৭,৩৬৫/- টাকা	১৮,৯৯,০১,৯৭৬/- টাকা	৬৭,৮৪,৫৯,৩৪১/- টাকা
১৯৮৭-৮৮	৩৯,৪৮,৮০,০৮৩/- টাকা	১৭,৪৩,২১,৪৫৬/- টাকা	৫৬,৯২,০১,৫৪৯/- টাকা
১৯৮৮-৮৯	৪২,৪৮,১১,২৪৬/- টাকা	১৭,১২,৩৫,৭৯৮/- টাকা	৫৯,৬০,৪৭,০৪৪/- টাকা
১৯৮৯-৯০	—	—	৭৬,২৩,৩১,১২৪/- টাকা

চম স্ট্যাম্প নগদ আদায়

১৯৮২-৮৩	৩১,১২,৭১,৫৭০/- টাকা
১৯৮৩-৮৪	৩১,০৮,৮১,১২৭/- টাকা
১৯৮৪-৮৫	১৭,০২,৩৬,৯১৮/- টাকা
১৯৮৫-৮৬	১৯,৪৩,০৫,৬৮৪/- টাকা
১৯৮৬-৮৭	১৪,৮১,৭০,৪৬৮/- টাকা
১৯৮৭-৮৮	৯,৮০,০৬,৩৪২/- টাকা
১৯৮৮-৮৯	৭,৮৯,২৯,০২৩/- টাকা

যমুনা সারচার্জ

১৯৮৪-৮৫	১,২২,৯৫,৯৬৫/- টাকা
১৯৮৫-৮৬	১,৮৩,০৪,৬৬৫/- টাকা
১৯৮৬-৮৭	১,৫৬,৭১,৬৫৫/- টাকা
১৯৮৭-৮৮	১,৫৬,৭১,৬৫৫/- টাকা
১৯৮৮-৮৯	১,৪২,২৪,৩৭০/- টাকা

১% এল, জি, কর বাবদ আয়

বৎসর	১০-রেজিস্ট্রিকরণ	১% অতিঃ কর	মোট
১৯৮১-৮২			১১,০৮,১৬,৪৭০/- টাকা
১৯৮২-৮৩			১২,০৭,৭৬,৫০০/- টাকা
১৯৮৩-৮৪			১৩,৬৩,৭৭,০১৫/- টাকা
১৯৮৪-৮৫			১২,৬৫,০০,৯৫৬/- টাকা
১৯৮৫-৮৬			১৬,৮৪,৪৪,৯৭১/- টাকা
১৯৮৬-৮৭			১৮,৬২,৭৭,০৪৩/- টাকা
১৯৮৭-৮৮			১৫,৭২,৯৭,৭০৪/- টাকা
১৯৮৮-৮৯			১৭,৫০,৯৪,৭৪২/- টাকা

ইদানিং দলিলে জমির মূল্য কম দেখিয়ে জমি রেজিস্ট্রী করবার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে এটি এক বিরাট হুমকী। এই অশুভ প্রবণতা রোধ না করলে আমাদের জাতীয় আয়ে বিরাট ঘাটতি দেখা দিবে।

জমি বিক্রির সময় দাতাকে ১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১৪২ অনুসারে এ মর্মে হলফ করতে হয় যে, প্রস্তাবিত সম্পত্তি নির্ভুলভাবে দলিলে বর্ণিত হয়েছে এবং এর মূল্য কম দেখানো হয়নি। রাষ্ট্রপতির এই আদেশের কোন রুলস করা হয়নি। এই মর্মে যদি উক্ত আদেশের রুলস করা যায় যে, রাষ্ট্রপতির উক্ত আদেশ ভংগ করলে হস্তান্তর দলিল বাতিল বলে গণ্য হবে এবং জমি সরকার বরাবরে বাজেয়াপ্ত হবে। তাহলে এ রুলস অনুসারে দৃষ্টান্তমূলকভাবে নিম্নমূল্য দেখানোর জন্য কিছু দলিলের জমি সরকার বরাবরে বাজেয়াপ্ত হলে দলিলে কম মূল্য দেখানোর প্রবণতা কমে যাবে।

বর্তমানে আইন প্রচলিত আছে যে, যদি পক্ষগণ স্ট্যাম্প এ্যাক্টের ২৭ ধারা অনুসারে স্ট্যাম্প ফি ফাঁকি দেয়ার জন্য জমির মূল্য কম দেখান তবে এ ক্ষেত্রে সাব-রেজিস্ট্রার মূল্য নির্ধারণের জন্য ডেপুটি কমিশনারের কাছে ঘাটতি স্ট্যাম্প শুল্ক আদায়ের জন্য লিখতে পারে এবং ডেপুটি কমিশনার তদন্তপূর্বক যদি দেখেন যে দলিলে মূল্য কম দেখান হয়েছে তবে মূল্য নির্ধারণপূর্বক তার বাকী স্ট্যাম্প আদায়ের জন্য সাব-রেজিস্ট্রারকে নির্দেশ দিবেন।

উপসংহার

১৭৮১ সন হতে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা, আদেশ ও অধ্যাদেশ জারীর মাধ্যমে বিবর্তিত হয়ে ১৯০৮ সনে রেজিস্ট্রেশন আইন পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করে। তারপর বহুকাল গত হয়েছে। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে বহু পরিবর্তন এসেছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবিত সাফল্য এসেছে। মানুষের চিন্তা-চেতনা, জীবনবোধ ও মূল্যবোধেরও পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধন হয়নি এই পরিদপ্তরের। শতাব্দীকালের পুরাতন

রেজিস্ট্রেশন আইন ও রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া স্বাভাবতই পশ্চাদপদ রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি আধুনিক যুগের চাহিদা মিটাতে পাচ্ছে না। পদ্ধতি অধিকতর গণমুখী ও আধুনিকায়ন হোক এটা সকলেরই কাম্য। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে রেজিস্ট্রেশন আইন রেজিস্ট্রেশন বিভাগের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি আধুনিকায়নের কিছু সুচিন্তিত সুপারিশ রাখা হয়েছে। আশা করা যায় এ সুপারিশগুলো বাস্তবায়িত হলে রেজিস্ট্রেশন পরিদপ্তরে গতি সঞ্চারিত হবে এবং জনগণ এর সুফল ভোগ করবে।

গ্রন্থপঞ্জী

- ১। রহমান, গাজী শামসুর : রেজিস্ট্রেশন আইনের ভাষ্য।
- ২। মুন্সী, ডি এফ : ভারতীয় রেজিস্ট্রেশন আইন।
- ৩। মুখোপাধ্যায়, দেবী প্রসাদ : দলিল লেখন ও রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি।
- ৪। Row's Sanjiva : Registration Act, 7th Edition.
- ৫। The Stamp Act, 1899.
- ৬। The Bengal Registration Manual, 1982.
- ৭। The Bangladesh Registration Manual, 1983.
- ৮। রেজিস্ট্রী পরিদপ্তর : রেজিস্ট্রীকৃত দলিলের মাধ্যমে সম্পত্তি হস্তান্তর পদ্ধতি।
- ৯। মুখপত্র, বাংলাদেশ রেজিস্ট্রেশন সার্ভিস এসোসিয়েশন : খিদমত।
- ১০। ভূমি মন্ত্রণালয় : অগ্রগতির পাঁচ বছর, ১৯৮২-১৯৮৭ ইং।
- ১১। অর্থ আইন, ১৯৯০ ইং।